হযরত আলী (রা.)

মূল: ফজল আহমদ, ইউকে

ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ

মূল লেখাটি প্রকাশিত হয় রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স-এর ডিসেম্বর, ২০০৭ সংখ্যায়। এর বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় আহমদীয়া মুসলিম জামা' ত, বাংলাদেশ-এর মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী-তে, ২০১১ সালের নভেম্বর থেকে। পরবর্তীতে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর মুখপত্র মাসিক আহ্বান-এও এটি প্রকাশিত হয়েছে। এখানে এটি সংশোধিত ও পরিমার্জিতরূপে উপস্থাপন করা হলো:

ভূমিকা

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি শিয়া মুসলমান হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) কাররাম আল্লাহু ওয়াজহাহু (আল্লাহ্ তার চেহারাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুগৃহীত করুন) - কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। মহানবী (সা.)-এর পর তারা হযরত আলীর (রা.) প্রতিই বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। ইসলামের একেবারে প্রথম পর্যায়ের অল্প কিছু মুসলমানের মধ্যে তিনি (রা.) অন্যতম। পরবর্তীকালে তিনি ইসলামের চতুর্থ খলীফার দায়িত্ব পালন করেন। পবিত্র কুরআন এবং ইসলামী আইন-কানুন সম্পর্কে তাকে একজন বিশেষজ্ঞ/অথরিটি হিসেবে অত্যন্ত সম্মান করা হতো।

এই প্রবন্ধে আমরা তার জীবন এবং ইসলামে তার ভূমিকা খতিয়ে দেখবো, রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টিও এখানে আলোচিত হবে। এছাড়া, শিয়া-সুন্নী বিভেদের পেছনের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হবে এখানে। এক্ষেত্রে, শিয়া-সুন্নী দুই পক্ষের কাছেই গৃহীত ইতিহাসের কোনো একটিকে চোখ বুঁজে গ্রহণ করার পরিবর্তে একটি ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র অঙ্কনের প্রতিই সবিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে।

পটভূমি

৫৯৯ সালে আরবের মক্কায় আলী বিন আবু তালিব (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ছিল আবু তালিব এবং মা ফাতিমা বিনতে আসাদ। কুরাইশদের বনু হাশিম শাখার নেতা ছিলেন আবু তালিব। মহানবী (সা.) বাল্যকালে তাঁর দাদা শাইবা ইবনে হাশিমের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছেন। তিনি আব্দুল মুত্তালিব নামেই সমধিক পরিচিত। শাইবা ইবনে হাশিমের (আব্দুল মুত্তালিবের) মৃত্যুর পর বালক মুহাম্মদ (সা.) চাচা আবু তালিবের ঘরেই বহু বছর আশ্রয় লাভ করেছিলেন।

এরপর তিনি (সা.) ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য বের হয়ে আসেন। মহানবী (সা.) পরবর্তীতে খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসা দেখাশোনা করেন এবং তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর বিয়ের তিন বছর পর তাঁর চাচাতো ভাই আলীর জন্ম হয়; তখন মহানবীর (সা.) বয়স ছিল ত্রিশ বছর। *[সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে পঁচিশ বছর বয়সে মহানবী (সা.) বিয়ে করেছিলেন। সেই হিসেবে এর তিন বছর পর আলীর জন্ম হলে তখন মহানবীর (সা.) বয়স আঠাশ বছর হওয়ার কথা - অনুবাদক।]*

মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক

মহানবী (সা.) আবু তালিবের সংসারে প্রতিপালিত হওয়ার সময়ে তাঁর চাচা আবু তালিবের দারিদ্র্য ও কাঠিন্যময় জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই, আলী যখন বাল্যাবস্থায় উপনীত হলো, মহানবী (সা.) তার পরিপূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। আলীর উপর তাঁর (সা.) অনেক প্রভাব ছিল। বিশেষত, তিনি (সা.) যখন মক্কার নিকটবর্তী হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান করতে যেতেন, বালক আলীই তখন সেখানে খাবার পৌঁছে দিত। অন্যান্য বিষয়ে অনেকগুলো ওহীর পর মহানবী (সা.) নিম্নোক্ত ওহী পেলেন:

> **"আর তুমি তোমার নিকট-আত্মীয়-স্বজনদের সতর্ক করো।"** [আশ্ শো'আরা, আয়াত: ২১৫]

এরপর, সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.) কুরাইশদের সবগুলো গোত্রকে নাম ধরে ডাকলেন এবং তাদেরকে সতর্ক করে বললেন, যদি তারা মন্দপথ পরিত্যাগ না করে, তবে তাদের মাথার

উপর ঐশী শাস্তি অপেক্ষমান রয়েছে। (বুখারী)। মহানবী (সা.) তাঁর নিজের পরিবারের এবং বংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন:

> **"হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা, আমি জানি আমার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোনো বাণী নিয়ে আর কোনো আরব তার লোকদের কাছে আসে নি। আমি তোমাদের জন্য এই জগতের এবং পরজগতের উৎকৃষ্টতম বিষয় নিয়ে এসেছি। আল্লাহ্ আমাকে আদেশ দিয়েছেন তাঁর প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান করতে। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে কে আমাকে এক্ষেত্রে সাহায্য করবে? কে আমার ভাই হয়ে, আমার কার্য-সম্পাদনকারী/নির্বাহক হবে? কে আমার উত্তরাধিকারী হবে?"**

আলীর (রা.) বয়স তখন ছিল দশ বছর। তার চাচাতো ভাই *[মুহাম্মদ (সা.)]* এবং খালা খাদিজাকে সেজদা করতে দেখে এবং তাদের উপাস্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে দেখে আলী কৌতুহলী হলেন। এই বিষয়ে সে মহানবী (সা.)-কে প্রশ্ন করলে জবাব এলো:

> **"আমরা অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ইবাদত করছিলাম। আমিও তোমাকে একইভাবে ইবাদত করতে বলছি। লাত, উজ্জা কিংবা অন্য কোনো মূর্তির প্রতি কখনো মাথা ঝুঁকিয়ো না।"**

লাত, উজ্জা এবং অন্যান্য মূর্তিগুলো ছিল স্থানীয় নাবাতিয়ান *[Nabatean]* গোত্রগুলোর এবং মক্কাবাসীদের প্রধান উপাস্য দেব-দেবী। আর, সেই যুগে এসব মূর্তিতে কাবাগৃহ পরিপূর্ণ ছিল।

বিভিন্ন প্রশ্নের সদুত্তর পেয়ে আলী সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হলেন। অচিরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এক্ষেত্রে স্বাধীন ও মুক্ত পুরুষদের মধ্যে *[বালক]* আলীই ছিলেন প্রথম। রাসূল (সা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি বলেছিলেন:

> **"আমার চোখে ঘাঁ/ক্ষত এবং আমার পা-দুটো সরু; কিন্তু, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি আপনার পাশে থাকবো।"**

আল্লাহ্‌র সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর সম্পর্কের বিষয়টি আলী প্রত্যক্ষভাবে জানতেন। এক্ষেত্রে কারো মধ্যবর্তীতার প্রয়োজন হয় নি। একই সঙ্গে বসবাসের কারণে আলী তা প্রত্যক্ষ করেছেন। মহানবী (সা.) আলীকে ঈমান সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগলেন, তাদের দু'জনের মধ্যকার সম্পর্কও ক্রমশ গভীর হতে থাকলো। তার বাবা আবু তালিব ইসলাম গ্রহণের আগেই

মৃত্যুবরণ করেন। তবে, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততোদিনই তিনি তার ভাতিজা মুহাম্মদ (সা.)-কে নিরাপত্তা দিয়ে গেছেন। মক্কার নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া প্রশমিত করার চেষ্টা করে গেছেন আবু তালিব। মক্কার এই নেতারা মনে করতো মুহাম্মদ (সা.)-এর নতুন বাণী *[ইসলাম]* তরুণদের সঙ্গে তাদের বাবা-মায়ের দূরত্ব সৃষ্টি করবে এবং দাসদের সঙ্গেও তাদের মালিকদের সম্পর্ক নষ্ট করবে।

৬২২ সালে যখন মুসলমানরা জুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হলো, তখন একটি আশঙ্কা ছিল যে, মক্কাবাসীরা হয়তো মহানবী (সা.)-কে আক্রমণ করবে এবং হত্যা করার চেষ্টা করবে। কারণ, তখনো তিনি (সা.) তাঁর ঘরেই অবস্থান করছিলেন। আলী (রা.)-কে তখন বলা হলো মহানবী (সা.)-এর বিছানায় ঘুমাতে, যেন পৌত্তলিকরা মনে করে যে, মুহাম্মদই (সা.) বিছানায় শুয়ে আছে। আর, ইত্যবসরে মহানবী (সা.) নিরাপদে মক্কা থেকে চলে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে আলী (রা.) তার জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র ফজলে রক্ষা পেয়েছিলেন। কিছু কিছু বর্ণনায় দেখা যায়, কুরাইশ ষড়যন্ত্রকারীরা মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘর ঘেরাও করে রেখেছিল এবং বিছানায় শায়িত আলীকে মুহাম্মদ (সা.) মনে করে হত্যা করার জন্য ঘরে প্রবেশ করেছিল। যখন তারা কম্বল সরিয়ে তরুণ আলীকে দেখলো, তারা হতভম্ব হয়ে গেল। মাঝ রাতে ঐশী নিরাপত্তায় মহানবী (সা.) ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, কুরাইশরা কেউই তা খেয়াল করে নি। বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে, মুশরেক যুবকরা তখন আলীকে (রা.) প্রহার করেছিল এবং আটক করেছিল, এমনকি কেউ কেউ তাকে হত্যা করার কথাও বলছিল। কিন্তু, তার প্রশান্ত হাবভাব দেখে তারা তাকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়।

হযরত আলী (রা.) অবশ্য এরপর আরো তিন দিন সাহসিকতার সঙ্গে সেখানো অবস্থান করেছেন। তার কারণও ছিল। মক্কার লোকেরা তাদের মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী মহানবী (সা.)-এর কাছে আমানত/গচ্ছিত রাখতো। সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই আলীকে সেখানে অবস্থান করতে হয়েছিল। সেই সময়ে, মক্কার অধিকাংশ লোক যদিও ইসলাম গ্রহণ করে নি, তবুও তাদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদই (সা.) ছিলেন সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত ও আমানতদার ব্যক্তি। তাই তারা তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র তাঁর (সা.) কাছে জমা রাখতো। ইয়াসরিবে (মদীনায়) হিজরত করার আগে এসব আমানত ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আলীকেই (রা.) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়টিতে আলীর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাসত্ত্বেও, তিনি তার দায়িত্ব যথাযথভাবেই পালন

করেছিলেন। পরবর্তীকালে, তার চরিত্রে এই নিঃস্বার্থ মনোভাব এবং সাহসিকতার দৃঢ় ছাপ প্রত্যক্ষ করা গেছে।

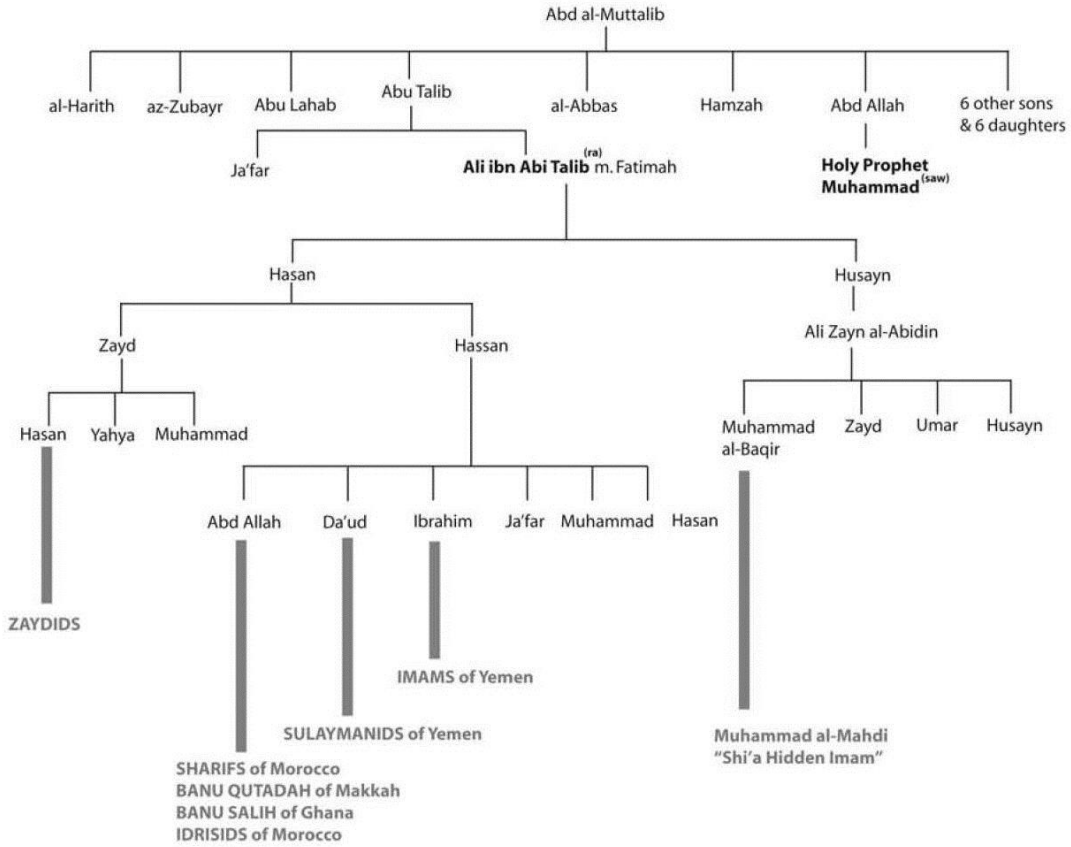

মুসলমানদের জামা'ত মদীনায় দশ বছর নির্বাসনে থাকার সময়টিতে বিভিন্ন অভিযানে ও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন হযরত আলী। এছাড়া, দূত হিসেবেও তাকে ভূমিকা রাখতে হয়েছে। ৬২৪ সালের বদরের যুদ্ধই ছিল তার প্রথম বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ। সেই সময়টিতে মুসলমানরা প্রবল জুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। মক্কার লোকেরা মুসলমানদেরকে সমূলে উৎখাত করতে এসেছিল। বদরের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। ইবনে হিশাম ও আল মাগাযির বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি কমপক্ষে ২০ জন মুশরেক হামলাকারীকে হত্যা করেছেন। এমনকি তিনি তাদের বীর যোদ্ধা আল-ওয়ালিদ ইবনে উৎবাকেও হত্যা করেছেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে, সেই যুগের রীতি অনুসারে, মক্কার যোদ্ধারা তাদের বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে মুসলমান বীর যোদ্ধাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল। তখন

মুসলমানদের পক্ষ থেকে আলী (রা.) সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন।

যাহোক, তার বীরত্বই তার সবকিছু নয়। উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে তিনি সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। তবে তিনি আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন ছিলেন না, অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছিলেন। আবেগের বশবর্তী হয়ে কখনোই তিনি উগ্রতা প্রদর্শন করেন নি। ইসলামের প্রতি দায়িত্ব অনুভব করার কারণে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন।

এমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় দেখা যায়, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আলী (রা.) একবার এক বিরুদ্ধবাদীকে পরাস্ত করেছিলেন। তিনি যখন তাকে চূড়ান্ত আঘাত করতে যাচ্ছেন, তখন সেই লোকটি হতাশ হয়ে আলীর (রা.) চেহারার উপর থুতু নিক্ষেপ করলো। যারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল, তাদেরকে বিস্মিত করে দিয়ে তিনি (রা.) তার শত্রুকে ছেড়ে দিলেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো: শত্রুকে বাগে পেয়েও কেন তাকে ছেড়ে দিলেন? জবাবে হযরত আলী (রা.) বলেন, তিনি যদি তখন তাকে হত্যা করতেন, তাহলে তার হত্যার উদ্দেশ্য হয়তো ইসলামের প্রতিরক্ষার খাতিরেই না হয়ে তার ব্যক্তিগত প্রতিশোধ-স্পৃহা থেকে উৎসরিত হতো। কারণ, সেই ব্যক্তি তার মুখমণ্ডলে থুতু দিয়েছিল। *[অর্থাৎ, লড়াইয়ের সময় শত্রুকে হত্যা করার ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত আবেগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু, এক্ষেত্রে লোকটি তার মুখে থুতু দেওয়াতে তার রাগ উঠে গিয়েছিল। আর, তিনি রাগের বশবর্তী হয়ে হত্যা করতে চান নি। - অনুবাদক]*

এক্ষেত্রে, তিনি শুধু সাহসিকতাই প্রদর্শন করেন নি; বরং, একইসঙ্গে নৈতিকতার অসাধারণ নমুনাও তুলে ধরেছেন। লড়াইয়ের ময়দানে চূড়ান্ত আবেগের সময়েও তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তার সৎ-উদ্দেশ্য এবং উত্তম মন-মানসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে, যেমন উহুদের যুদ্ধে, তিনি আবারো একই রকম শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেছেন। "জুলফিকার" নামে তার একটি বিশেষ ধরনের তলোয়ার ছিল। সেই তলোয়ারের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে লোকে তাকে সহজে চিনে ফেলতো। তলোয়ারটির দু'টি ফলক ছিল ও এটি কিছুটা বাঁকানো ছিল। আল-তাবারি মনে করেন, মুসলিম সেনাদলের বৈশিষ্টসূচক পতাকা/নিশান বহন করতেন আলী (রা.)। পৌত্তলিকদের পতাকা বহনকারীদেরকে আক্রমণ করে ভূপাতিতও করতেন তিনি। সেই যুদ্ধে *[উহুদের যুদ্ধে]* শত্রুরা একটি গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল এবং সেটি ঘাস ও ডালপালা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। মহানবী (সা.) সেই গর্তে পড়ে

গিয়েছিলেন। তখন আলী (রা.) এবং আবু বকর (রা.) তাঁকে (সা.) গর্ত থেকে বের হতে সাহায্য করেছিলেন। পরে আলী (রা.) ও তার স্ত্রী ফাতেমা (রা.) মহানবী (সা.)-এর ক্ষত পরিষ্কার করে পটি বেঁধে দেন।

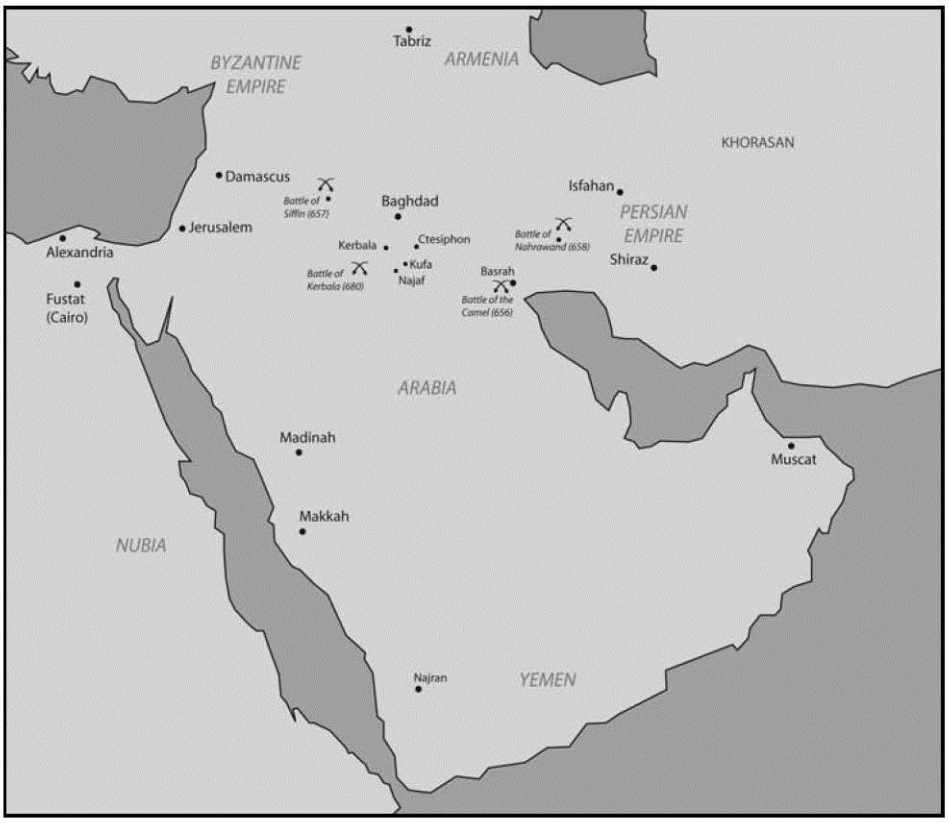

শান্তির সময়ে, মুসলমানরা যখন নতুন শহর মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করছিল, তখন আলী (রা.) ইসলামের খাতিরে কায়িক পরিশ্রম করছিলেন। মদীনার আশেপাশে বিভিন্ন খামারে পানি সেচের জন্য কুয়া থেকে পানি উত্তোলনের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি।

মহানবী (সা.)-এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তিনি। বদরের যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তার এক বছর পর, ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.)-এর কনিষ্ঠ মেয়ে ফাতেমার সঙ্গে আলীর (রা.) বিয়ে হয়। নতুন মেয়ে-জামাইয়ের প্রতি অশেষ স্নেহ প্রদর্শন করেছেন মহানবী (সা.)। আলী এবং ফাতেমা উভয়ের প্রতিই তিনি (সা.) বিয়ের দিন বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। আর, এমনভাবে অংশ নিয়েছিলেন যা তিনি (সা.) আগে আর কারো বিয়েতে করেন নি। সেই সময়ে মুসলমানরা খুবই সাদামাটা অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতো। তাদের হাতে অর্থ-কড়িও তেমন একটা ছিল না। কারণ, তাদের অনেকেই মক্কা থেকে হিজরত করে এসেছিলেন এবং সেখানে

তাদের সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিয়ের দেনমোহর হিসেবে আলী (রা.) তার ঢাল প্রদান করলেন। এথেকে তার অবস্থা কেমন ছিল তা বুঝা যায়। তখন, মহানবী (সা.) তাঁর মেয়েকে একটি সাধারণ তোশক, একটি পানির মশক *[চামড়ার ব্যাগ]*, একটি খাট এবং দু'টি যাতা ও দু'টি মাটির কলস দিয়েছিলেন। এথেকে বুঝা যায় প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অবস্থা কেমন ছিল।

হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ফাতিমার (রা.) তিন ছেলে ছিল: হাসান, হোসেইন এবং মোহসিন। মোহসিন শৈশবে মারা যায়। জয়নাব নামে তাদের একটি মেয়েও ছিল। এই বিয়ের মাধ্যমে মহানবী (সা.) ও আলীর (রা.) মধ্যকার সম্পর্কের বন্ধন আরো দৃঢ় হলো। সাহিল ইবনে সাদ বর্ণনা করেন:

> **"'আবু তুরাব' নামটি সবচে' বেশি পছন্দ করতেন আলী (রা.)। (এর অর্থ 'ধূলি-ধূসরিত'; আক্ষরিক অর্থে 'ধূলার বাপ')। কেউ তাকে এ নামে ডাকলে তিনি খুশি হতেন। মহানবী (সা.) ছাড়া অন্য আর কেউ তাকে এই নাম দেয় নি। কারণ, একদিন আলী (রা.) ফাতিমার প্রতি রাগ করেছিলেন। ঘর থেকে বের হয়ে তিনি মসজিদের দেয়ালে হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন। তখন মহানবী (সা.) এসে দেখেন তার পিঠ ধূলাতে ঢেকে গেছে। তিনি (সা.) তার পিঠ থেকে ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'বসে পড় আবু তুরাব'।"**

এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.) আলীকে কী রকম পছন্দ করতেন।

এভাবে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, একবার মহানবী (সা.) আলীর পাশে বসে *[দু'জনে একসঙ্গে]* খেজুর খাচ্ছিলেন এবং বিঁচিগুলো তাঁর *[নিজের]* সামনে রাখছিলেন। তখন আলী দুষ্টুমি করে তার *[নিজের অংশের]* বিঁচিগুলোও মহানবী (সা.)-এর সামনে রাখছিল। যখন মহানবী (সা.)-কে বলা হলো যে, তিনি অনেক বেশি খেজুর খেয়ে ফেলেছেন *[কারণ, সবগুলো বিঁচি তাঁর সামনে ছিল]*, তখন তিনি (সা.) তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন: কেউ কেউ তো বিঁচিসহই খেয়ে ফেলেছে।

অবশেষে, ৬৩০ সালে যখন মুসলমানরা মক্কা বিজয় করলো, আলী (রা.) তখন এক ডিভিশন সৈন্যের নেতৃত্বে ছিলেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে শহরটি দখল করেছিলেন। কাবা-প্রাঙ্গনে অবস্থিত পুরনো বহু প্রস্তর-মূর্তি ভাঙ্গার ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকা রেখেছেন। যারা তাদেরকে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করেছিল এবং যারা এরপরও মদীনাতে একাধিকবার আক্রমণ করেছিল, সেই পুরনো

শত্রুদের প্রতি মুসলমানদের মহানুভবতার ঘটনা ইতিহাসের একটি অন্যতম অধ্যায়। এতোকিছুর পরও মহানবী (সা.) মক্কাবাসীদেরকে ক্ষমা করেছিলেন।

৬৩১ খ্রিস্টাব্দে আলী (রা.)-কে ইয়েমেনে ইসলাম প্রচারের মিশনের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়। জীবদ্দশায় মহানবী (সা.) যতগুলো তবলীগি মিশন প্রেরণ করেছিলেন, এটি ছিল সেগুলোর মধ্যে সর্বশেষ। শীতের মধ্যভাগে আলী (রা.) ইয়েমেনে পৌঁছান। প্রথমে যদিও সেখানকার গোত্রগুলো শত্রু-ভাবাপন্ন ছিল; কিন্তু, অচিরেই মাজাজ ও হামাদান গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর কয়েক বছর আগে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) এখানে এসে তবলীগ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, তাদের সামনে ইসলাম তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি সেরকম সফল হন নি, তার কুরআনী জ্ঞানও ততোটা ছিল না। এক্ষেত্রে, হযরত আলী (রা.) এই গোত্রীয় লোকদের মন জয় করতে সক্ষম হন।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে অন্যান্য মুসলমানদের মতো আলী (রা.) ও শোকাহত ও বিমূঢ় হয়ে যান। মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাঁর পরিবারের একজন সদস্য ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে আলী (রা.) তাঁর (সা.) সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর (সা.) পবিত্র মৃতদেহের গোসল যারা করিয়েছেন, সেই দলের মধ্যেও তিনি (রা.) ও তার চাচা আব্বাস (রা.) ছিলেন। এছাড়া, মৃতদেহ কবরে শায়িত করার সময়েও হাত লাগিয়েছেন আলী (রা.)।

বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলমানদের একটি অংশ খলীফা নির্বাচনের জন্য ভোট দিয়েছিলেন। তাদের ভোটে হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এখান থেকেই শিয়ারা সুন্নীদের থেকে পৃথক হয়ে বিপথগামী হয়ে যায়। কারণ, তারা বিশ্বাস করতো আলী (রা.) খলীফা হওয়ার হকদার ছিলেন। সেজন্য তারা প্রথম তিন খলীফা হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর এই পদমর্যাদা লাভ করাটা পছন্দ করে নি। কিছু শিয়া আরও অগ্রসর হয়ে পূর্ববর্তী এই খলীফাদেরকে অভিশাপ দিয়ে থাকে। এই রীতিকে "তাবাররা" বলা হয়। এই বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য আমাদের উচিত পূর্ববর্তী খলীফাদের অধীনে হযরত আলীর (রা.) ভূমিকা কী ছিল তা পর্যালোচনা করে দেখা। এক্ষেত্রে সত্যিকারের তথ্য-উপাত্ত, ঘটনা ও বিভিন্ন প্রমাণাদি খতিয়ে দেখতে হবে। তিনি হয়তো কিছু চিন্তা করছিলেন, এমন আনুমানিক বিষয়ের উপর ভরসা করা যাবে না। অথবা, তিনি

পূর্ববর্তী খলীফাদের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে ভান করেছেন, এ রকম কথাও বানিয়ে বলা যাবে না।

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর আনুগত্য স্বীকার করে বয়আত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে-সব বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলোতে দেখা যায়, হযরত আলী (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে বয়আত করেছেন। আবার, কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি কয়েকদিন পর বয়আত করেছেন। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে বলা যায়, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচনের রায় মেনে নিয়েছেন এবং নতুন খলীফার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন। কারণ, মুসলমানদের একতা রক্ষার বিষয়ে তিনি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। একদিকে শিয়ারা দাবি করে যে, তিনি নিজেকে এসব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন এই চিন্তা করে যে, তার খলীফা হওয়ার হক ছিল। যাহোক, এমনকি তাদের তথ্যের উৎস, শেখ আলি আল-বাহরানী সম্পাদিত **'মিনার আল-হুদা'**-তে হযরত আলী (রা.)-এর একটি উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয়েছে যেখানে আলী (রা.) বলেছেন:

> **"আমি নিজেকে পশ্চাদপটে সরিয়ে রেখেছিলাম ততোক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমি উপলব্ধি করেছি যে, কতিপয় গোষ্ঠী ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে এবং মানুষদেরকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান জানাচ্ছে, যেন তারা ইসলামের ধ্বংসসাধন করতে পারে ... । অতএব, আমি আবু বকরের কাছে গেলাম এবং তার আনুগত্যের শপথ নিলাম এবং সর্বদা তার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে সে-সব বাঁধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেলাম এবং সেগুলো অচিরেই মিটে গেল।"**

আলেম ইবনে-জরির আল-তাবারি (৮৩৮-৯২৩) তার **"তারিখ-উর-রাসূল ওয়াল মুলক"** গ্রন্থে হাবিব ইবনে সাবিতের সাক্ষ্যের বরাতে লিখেছেন:

> **"আলী তার ঘরে বসে ছিলেন যখন এক ব্যক্তি এসে তাকে বললো যে, আবু বকর মসজিদে বসে আছেন এবং সেখানে উপস্থিত মুসলমানদের বয়আত গ্রহণ করছেন। একথা শুনে আলী তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেন। এমনকি তিনি ভাল পোশাকও পরিধান করার পরোয়া করলেন না। তখন তিনি একটি লম্বা সার্ট/কোর্তা/আলখেল্লা পরে ছিলেন। তিনি এতো তাড়াহুড়া করেছিলেন; কারণ, তিনি এ বিষয়ে পিছনে পড়ে থাকতে চান নি। তাই, তিনি সেখানে**

গেলেন এবং বয়আত করলেন এবং আবু বকরের কাছেই বসে থাকলেন।"

(আল-তাবারি, History of the Prophets and Kings, Vol.2)

এটা সুনিশ্চিত যে, আলী (রা.)-এর কোনো মোহ/ভ্রম ছিল না। পরবর্তীতে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, ইবনে-ই-আশকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি *[আলী]* জবাব দিয়েছেন, মহানবী (সা.) অকস্মাৎ মারা যান নি। দীর্ঘ দিন অসুস্থ্য থাকার পর তিনি (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। সেই সময়টিতে তিনি কখনোই কোনো ইঙ্গিত দেন নি যে, তার পরে আলী (রা.)-ই হবেন ন্যায়সঙ্গত খলীফা। বস্তুত, সেই দিনগুলোতে তিনি (সা.) আবু বকরকে (রা.) নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আর সাহাবীদের জন্য এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর পর কে খলীফা হবেন।

এটি আরো বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকরের (রা.) খেলাফতকালে ফাতিমা (রা.) মহানবী (সা.)-এর একটি সম্পত্তি দাবী করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) সেই দাবী এই কারণে নাকচ করে দিয়েছিলেন যে, মহানবী (সা.)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাইতুল মালের অধিকারভুক্ত। পরবর্তীকালে, হযরত আবু বকরের (রা.) সঙ্গে হযরত আলীর (রা.) দেখা-সাক্ষাৎ হলেও তিনি কখনোই এই বিষয়ে কোনো কথা বলেন নি। বরং, তিনি সর্বদাই আবু বকরের (রা.) প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন।

পূর্ববর্তী খলীফাদের অধীনে ভূমিকা

আলী (রা.) নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, তার জোরালো মতামতও ছিল; তারপরও পূর্ববর্তী খলীফাদের অধীনে থেকে তিনি পরিপূর্ণ আনুগত্য করেছেন এবং বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত আবু বকরের (রা.) খেলাফত কালে তিনি তখনও তরুণ ছিলেন এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাই, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর, বিভিন্ন উদ্বেগ-উত্তেজনা এবং সম্ভাব্য দলাদলি প্রতিহত করার ক্ষেত্রে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) কীভাবে ইসলাম সম্পর্কে তার পরিমিত ও ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন সেটি দেখে হযরত আলী (রা.) অনেক কিছু শিখতেন। তিনি (রা.) হযরত আবু বকরের (রা.) সমস্ত হুকুম পালন করেছেন এবং বিশ্বস্ত বন্ধু, সহযোগী ও সমর্থনকারী মিত্রে পরিণত হয়েছিলেন।

হযরত আবু বকরের (রা.) খেলাফতের প্রথম কয়েকটি মাস মুসলমানরা মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছিল। কারণ, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর নতুন

নেতৃত্বের অধীনে অভ্যস্ত হতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই হযরত ফাতেমা (রা.) ইন্তেকাল করেন। ফলে হযরত আলীর (রা.) জন্য এই মনোকষ্ট আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হযরত আবু বকরের (রা.) মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফত কালেও আলী (রা.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কুরআন ও ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স *[ইসলামী আইনের দর্শন ও বিজ্ঞান]* সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান রাখতেন তিনি। তাই, হযরত উমর (রা.) তাকে জ্যেষ্ঠ বিচারকের দায়িত্ব দেন। আলীর (রা.) বিচার-বিবেচনার প্রতি আস্থা ছিল তার। সেজন্য কঠিন কঠিন মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসার ভার আলীর (রা.) প্রতিই অর্পণ করতেন হযরত উমর (রা.)।

হযরত উমরের (রা.) খেলাফত কালে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জেরুজালেম বিজয় হয়। তিনি সেখানে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করতে যান। জেরুজালেম যাওয়ার সময়ে তিনি (রা.) ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসন-কেন্দ্র মদীনার দায়িত্বভার হযরত আলীর (রা.) উপর অর্পণ করেন। খলীফা হযরত উমর (রা.) আলীর (রা.) প্রতি কতোটা আস্থা রাখতেন সেটা এই ঘটনা থেকেও বুঝা যায়।

আলী (রা.) অবশ্য সব সময়েই খলীফাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত হতেন না। মাঝে মাঝে তিনি ভিন্নমতও পোষণ করতেন। যেমন, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধলব্ধ সম্পদের *[মালে-গণিমত]* বণ্টনের বিষয়ে হযরত উমরের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত হন নি। অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে খলীফা হযরত উমর (রা.) মালে-গণিমতের কিছু অংশ হাতে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু, আলী (রা.) বলেন, সবটুকুই বণ্টন করে দিতে হবে; কারণ, বিপদ-আপদের বিষয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা *[তাওয়াক্কল]* করা উচিত। তিনি হয়তো সৈনিকদের সমর্থনও লাভ করেছিলেন। কারণ, পরবর্তীতে হযরত উসমানের সঙ্গেও তার একই মতপার্থক্য ঘটেছিল। এ সম্পর্কে Karen Armstrong বলেন:

> **"অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা ক্রমাগতভাবে মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই আলী ইবনে আবু তালিবের দিকে তাকাচ্ছিল। এটি প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, 'সৈনিকদের অধিকার' রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং এভাবে উমর ও উসমান - উভয়ের নীতিরই/কর্মপন্থারই বিরোধিতা করেছিলেন তিনি।"** *(Islam - A Short History, p.28)*

তিনি হয়তো কয়েকটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কিন্তু, তারপরও তিনি তার পূর্ববর্তী খলীফাদের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। বিশৃঙ্খলার সময়ে তদন্ত করে রিপোর্ট করার জন্য হযরত উসমান (রা.) আলীকেই (রা.) নিয়োজিত করেছিলেন। তখন মিশরের একদল মুসলমান অভিযোগ তুলেছিল, আল-ফুসতাতে (বর্তমান কায়রো) মিশরের গভর্নরের কাছে কঠোর নির্দেশনা সম্বলিত একটি চিঠি নাকি পাঠানো হয়েছে। আসলে সেটি ছিল একটি জাল চিঠি। এই ষড়যন্ত্র উদঘাটনে বড় ভূমিকা রাখেন আলী (রা.)।

এমনকি হযরত উসমান (রা.) যখন তার বাসভবনে আক্রান্ত হন, তখনও বাড়ির সম্মুখভাগে পাহাড়ায় নিয়োজিত ছিল আলীর (রা.) দুই ছেলে হাসান এবং হোসেইন। কিন্তু, দূর্ভাগ্যক্রমে বিদ্রোহীরা বাড়ির সামনের দিকে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সবার মনোযোগ ঘুরিয়ে দেয় এবং ইত্যবসরে বাড়ির পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে।

হযরত আলীর (রা.) খেলাফত

ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলার যুগে যখন তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.) শহীদ হন, তখন হযরত আলী (রা.) ইসলামের চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত উসমানও (রা.) মহানবী (সা.)-এর জামাতা ছিলেন। এছাড়া, তিনি সরল, অকপট এবং মর্যাদাবান নেতা ছিলেন। তাই, তার অসময়োচিত মৃত্যুর ঘটনায় আলী (রা.) হতভম্ব ও বিমর্ষ হয়ে যান।

হযরত আলী (রা.) খলীফা হতে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু, সেই সময়ে মদীনার লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তখন দুই হাজারেরও বেশি বিদ্রোহী সেখানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। তারা হযরত উসমানকে (রা.) হত্যা করেছিল। এ রকম পরিস্থিতিতে মদীনার মসজিদে নববীতে মুসলমানগণ সমবেত হলো এবং মদীনার আনসার ও মুহাজেরদের মধ্য থেকে শোর উঠলো। তারা হযরত আলীকে (রা.) অনুরোধ করলো খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে এবং আইন-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করতে। সেদিন তারা সবাই হযরত আলীর (রা.) হাতে বয়আত করলো। তবে, উমাইয়া পরিবারের কেউ কেউ অবশ্য বয়আত গ্রহণ করে নি। হযরত উসমানের রক্তমাখা জামা নিয়ে তারা সিরিয়াতে পালিয়ে যায়।

প্রথম ভাষণে হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থিত মুসলমানদেরকে বলেন:

"কা'বার পার্শ্ববর্তী এলাকা পবিত্র। আল্লাহ্ মুসলমানদের পরস্পরকে ভাই হিসেবে জীবন-যাপন করতে বলেন। তিনিই মুসলমান যিনি কাউকেই তার কথায় কিংবা কাজে আঘাত দেন না। মানুষের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ভয় করুন। শেষ বিচারের দিনে আপনাকে আপনার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এমনকি পশুর সঙ্গে আচরণের জন্যও (জবাবদিহি করতে হবে)। তাই, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র আনুগত্য করুন। তাঁর আদেশ-নিষেধগুলোকে পরিত্যাগ করবেন না।"

আলী (রা.) জানতেন সামনে আরো কঠিন সময় আসছে। সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস এবং অরাজকতার দ্বার অবারিত হয়ে গেছে। এসব মোকাবিলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন, ধৈর্য ধারণ করা প্রয়োজন। আইন-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের জন্য অনেক কৌশলী হওয়াও দরকার। তিনি আশা করলেন তার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের পাশাপাশি বিভিন্ন মানুষের সহায়তায় এসব কাজ সম্পাদন করবেন।

তার প্রথম বক্তৃতার পরপরই একটি প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে দেখা করে শরিয়াহ আইন প্রয়োগের কথা বলে এবং হযরত উসমানের (রা.) হত্যাকারীদের শাস্তি দাবি করে। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে তালহা এবং যুবায়েরও ছিলেন। তীব্র আবেগময় পরিস্থিতি তখনো বিরাজ করছিল। তা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) জবাব দেন:

"উসমানের মৃত্যুকে আমি বিনা প্রতিশোধে ছেড়ে দিব না। কিন্তু, তোমাদেরকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয় নি। দাঙ্গাবাজরা এখনো মদীনায় ক্ষমতাশালী হয়ে আছে। আর, আমরা এখনো তাদের কব্জায় আছি। আমার নিজের অবস্থানও নড়বড়ে। তাই, আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করছি, অপেক্ষা করো। যখনই পরিস্থিতি ঠিক হবে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করবো।"

এটি পরিষ্কার যে, সব সাহাবী এই জবাবে সন্তুষ্ট হন নি। কিন্তু, আলী (রা.) নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে কাজ শুরু করেছিলেন। বিভিন্ন পদে তিনি তার বিশ্বস্ত লোকদেরকে বসাচ্ছিলেন। আঞ্চলিক প্রশাসকদের/গভর্নরদের অনেককেই পরিবর্তন করেছেন তিনি। যেমন, সালমান ফার্সি ও মালিক আল-আশতারকে গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। এসব পরিবর্তনের

বিষয়েও সবাই একমত ছিল না। অনেকেই তাকে পরামর্শ দিয়েছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী/দলকে খুশি রাখার জন্য কিছু কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। এ সম্পর্কে ইবনে খালদুন বর্ণনা করেন:

> **"আলীকে তার খেলাফতের শুরুতেই আল-মুগিরাহ পরামর্শ দিয়েছিলেন, আয-যুবায়ের, মুয়াবিয়া এবং তালহাকে তাদের পদ থেকে অপসারণ না করতে। যতদিন পর্যন্ত না জনগণ তার হাতে বয়আত করতে সম্মত হয় এবং পুরো বিষয়টি সুসংহত হয়। এর পরে, তিনি যা চান তা করতে পারবেন। সেটি ছিল ভাল 'পাওয়ার পলিটিক্স' *[শক্তির কূটনীতি, যে কূটনীতির পেছনে সামরিক শক্তির সমর্থন থাকে]* । যাহোক, আলী এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা পরিহার করতে চেয়েছিলেন। কারণ, ইসলামে এসবের স্থান নেই।"** *(ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা: ১৬৫)*

হযরত উসমানের (রা.) মৃত্যু-পরবর্তী পরিস্থিতি আলীকে (রা.) গভীরভাবে কষ্ট দিচ্ছিল। তিনি (রা.) সত্যি সত্যি মনে করতেন তৃতীয় খলীফা যে-সব সমস্যার সম্মুখিন হয়েছিলেন সেগুলোর জন্য তাকে ঘিরে থাকা বনু উমাইয়া পরিবারের লোকজনই দায়ী ছিল। তারা খলীফার বৃদ্ধ বয়সের এবং ধৈর্যশীলতার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিল এবং তার অপব্যবহার করেছিল। এই কারণেই হযরত আলী (রা.) ইসলামী শাসনকেন্দ্র মদীনার বাইরে অবস্থিত অন্যান্য অঞ্চলে কর্মরত তাদের বহু লোককে অপসারণ করেছেন।

চিঠি ও খুতবার মাধ্যমে অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তার সুখ্যাতি ছিল। বহু বছর মহানবী (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার কারণে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। অমুসলিমদের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা ও সমবেদনা ইত্যাদি সদ্গুণের প্রশংসা করার মাধ্যমে তিনি এই জ্ঞান প্রয়োগ করলেন। অমুসলিমরা তখন মুসলিম শাসনের অধীনে আসছিল।

জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ)

অচিরেই, সেই একই সাহাবী তালহা এবং যুবায়ের হযরত আলীর (রা.) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহে মহানবী (সা.)-এর স্ত্রী আয়েশাও (রা.) যোগ দেন। এটি ৬৫৬ সালের ডিসেম্বরের ঘটনা। হযরত উসমানের (রা.) হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানে আলী (রা.) ব্যর্থ হওয়ার কারণে তারা হতাশ হয়ে যায় এবং বিদ্রোহ করে। হযরত আলীও (রা.) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে

চাচ্ছিলেন এবং হযরত উসমানের (রা.) হত্যাকারীদেরকে শায়েস্তা করতেও চাচ্ছিলেন। সেজন্য অসদ্ভাব ও বিদ্বেষ বৃদ্ধির পরিবর্তে তিনি প্রথমে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন এবং এরপর হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। যাহোক, এই বাস্তবসম্মত কর্মপন্থা মানার ক্ষেত্রে সবার সমান ধৈর্য ছিল না।

হযরত উসমানকে (রা.) যখন হত্যা করা হয়, তখন আয়েশা (রা.) হজ্জে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে মক্কায় এক জন-সমাবেশে বক্তৃতা দেন। এরপর শত শত সৈন্য নিয়ে তিনি বসরাহ গমন করেন আরো সমর্থন লাভের আশায়। পথিমধ্যে আরো লোকজন তাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং কাফেলাটি তিন হাজার লোকের সেনাদলে পরিণত হয়। তখন বসরার লোকদের জনমত বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, শহর দখলের পর নেতারা হযরত উসমানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকারীদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে এবং সমূলে বিনাশ করে। তারা শত শত সন্দেহভাজন বিদ্রোহীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাদের মধ্যে যারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করে। তখন বসরার সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করছিল। এরপর আয়েশা (রা.) মুসলিম সাম্রাজ্যের বাকি অংশের কাছে সমর্থন চাইলেন *[হযরত উসমানের]* সন্দেহভাজন হত্যাকারীদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য। ফলে অশান্তি আরো বৃদ্ধি পেল।

বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য হযরত আলী (রা.) তার নিজস্ব সেনাদল নিয়ে বসরাহ্ যেতে বাধ্য হলেন। কুফা থেকে নয় হাজার লোক তার সঙ্গে যোগ দিল। বসরায় পৌঁছানোর পর তিনি আয়েশা (রা.)-এর কাছে শান্তি-বার্তাবাহী প্রতিনিধি-দল পাঠালেন নিম্নলিখিত বাণী সহকারে:

> **“প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি খুবই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু, প্রথমে খলীফার হাতকে শক্তিশালী না করে আপনি কীভাবে দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করেন? ... আপনি যদি সত্যি সত্যিই বিবাদের পরিসমাপ্তি চান, তাহলে খলীফার ঝাণ্ডাতলে সমবেত হন। জনসাধারণকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিবেন না।”**

মনে হচ্ছিল উভয় পক্ষই শান্তি স্থাপন করতে যাচ্ছে। কিন্তু, আবদুল্লাহ বিন সাবার নেতৃত্বাধীন একটি দল অনুধাবন করলো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তারা হযরত উসমানের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারী হিসেবে ধরা পড়ে যাবে। তাই, রাতের আঁধারে তাদের দলটি হযরত আলী (রা.) ও আয়েশার (রা.) শিবির দু’টির মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দিল। তারা হযরত আলীর (রা.) শিবিরে

খবর দিল যে, অপরপক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আবার, হযরত আয়েশার (রা.) শিবিরে গিয়েও একইভাবে বলল, হযরত আলীর (রা.) লোকজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফলে, পুরোদস্তুর লড়াই বেঁধে গেল। হযরত আলী (রা.) এই ভয়টিই করছিলেন। মুসলমানদের দুই দলের এই লড়াইয়ে দশ হাজার মুসলমান মারা গেল। পরিশেষে, যদিও খলীফা হযরত আলীর (রা.) দলই বিজয়ী হলো; কিন্তু, এই অনাবশ্যক রক্তপাতের ঘটনায় তার হৃদয়েও রক্তক্ষরণ হতে থাকলো।

বসরাতে সংঘটিত এই যুদ্ধটি **'জঙ্গে জামাল'** (উটের যুদ্ধ) নামে পরিচিত। আলী (রা.) যদিও এই বিদ্রোহ দমন করলেন, তথাপি বিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকলো। কোনো প্রকারের নিগ্রহ না করে, সম্মানের সঙ্গেই হযরত আয়েশাকে (রা.) মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আলী (রা.) যখন শুনলেন তালহা এবং যুবায়ের মারা গিয়েছেন, তাদের বৈরিতা সত্ত্বেও তিনি তাদের জন্য অশ্রুপাত করলেন। তিনি বললেন, ভুল বোঝাবুঝির ফলেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় তারা দু'জনই *[তালহা এবং যুবায়ের]* মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি *[আলী (রা.)]* একবার মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছেন:

"সব নবীরই একজন শিষ্য ছিল আর আমার শিষ্য হলো আয্-যুবায়ের।"

কেউ যদি মনে করেন যে, এই লড়াইয়ের জন্য আলী (রা.) যশ ও গৌরবের অধিকারী হয়েছেন - এটা পুরোপুরিই ভুল। আসলে এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে তাকে নিপতিত করা হয়েছিল। গোলযোগ সৃষ্টিকারীরা আসলে ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছিল অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।

হযরত উসমানের (রা.) হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও হযরত আলী (রা.) কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। এমনকি যে-সব ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের ঘটনার পরিণতি হিসেবে হযরত উসমান (রা.) নিহত হন, সেগুলোর সঙ্গেও হযরত আলীর (রা.) কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। আল-তাবারির বর্ণনায় দেখা যায়, খলীফা হওয়ার পর তার প্রথম খুতবায় হযরত আলী (রা.) এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন এবং বিদ্রোহীদেরকে শয়তানের দোসর বলে অভিহিত করেন। উপস্থিত মুসুল্লীদেরকে তিনি একজন মুসলমান ভাইয়ের রক্তপাত ঘটানোর মতো নিকৃষ্ট কাজের ভয়াবহতার কথাও স্মরণ করান। এই অবস্থান থেকেই তিনি প্রথমে মুসলমানদের মধ্যে শান্তি এবং একতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে চান।

মুয়াবিয়ার সঙ্গে বিরোধ

হযরত আলীর (রা.) খেলাফত ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া। ফলে ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বেঁধে যায়। এটি সিফ্ফিনের যুদ্ধ নামে পরিচিত। অবশেষে তারা মধ্যস্থতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু, আযরুহ-তে *[একটি স্থানের নাম]* তা সমাধা হওয়ার পরিবর্তে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আলীর (রা.) সেনাবাহিনী থেকে চার হাজার সৈন্যের একটি দল তাকে ছেড়ে চলে যায় এবং তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে, এই দলটি **'খারেজি'** নামে পরিচিতি লাভ করে। তারা টেসিফোনে লুটতরাজ করে এবং এরপর ৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে নাহরাওয়ান্দ-এ হযরত আলীর (রা.) অনুগত বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। *[টেসিফোন (Ctesiphon) ইরাকে অবস্থিত একটি প্রাচীন নগরী। বর্তমানে একে আল-মাদায়েন বলা হয়। বাগদাদ থেকে ৩৫ কি.মি. দক্ষিণে টাইগ্রিস (দজলা) নদীর পূর্বতীরে এর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। - অনুবাদক]।*

তখন ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সমস্যাও উদ্ভুত হচ্ছিল। তারপরও, হযরত আলী (রা.) আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রেখেছিলেন। তিনি গভীর প্রার্থনায় নিমগ্ন হতেন। নিয়মিত ফরজ আদায়ের পাশাপাশি তিনি নফল নামাজও পড়তেন। প্রায়ই তিনি রাতভর ঈবাদতে রত হতেন। তার প্রার্থনার কারণেই তিনি ও প্রথম যুগের মুসলমানগণ নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন। নতুবা, তখনকার পরিস্থিতি এতোটাই প্রতিকূল ছিল, তাদের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র হচ্ছিল যে, পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারতো।

কোনো এক ব্যক্তি হযরত আলীকে (রা.) জিজ্ঞাসা করেছিলেন:

> **"মানুষ কেন আপনার সঙ্গে মতভেদ করে? আর, তারা কেন আবু বকর (রা.) এবং উমরের (রা.) সঙ্গে মতভেদ করে নি?"**

তিনি (রা.) জবাব দেন:

> **"কারণ, আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.) আমার মতো লোকদের ইনচার্জ/তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আর, আজ আমি তোমার মতো লোকদের নেগরান/তত্ত্বাবধায়ক।"**

ন্যায়বিচারের প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি তার অনুগামীদেরকে বলতেন, লোকদের সঙ্গে সে-রকম আচরণ করো যে-আচরণ তুমি তাদের কাছে প্রত্যাশা করো। অনুসারীদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর আগে, এই চেতনার দ্বারা পরিচালিত হয়েই তিনি মুসলিম বিশ্বে সুস্থিত অবস্থা এবং ভারসাম্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

নাহরাওয়ান্দ-এ খারেজিদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করায় তিনি কিছুটা সমর্থন ও আনুকূল্য হারান। খারেজিরা চাচ্ছিল তাদের দৃষ্টিতে সত্যিকারের মুসলিম নেতৃত্ব, যা কিনা কুরআনী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে; আর, যারা রাজনৈতিক ফায়দা গ্রহণ করতে চায়, তাদের সঙ্গে কোনো আপোষ করা যাবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি কিছু কিছু সমর্থন পেতে থাকলো, যদিও 'মোটিভ' বা অভিপ্রায় সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা ভ্রান্তিমূলক ছিল।

'জঙ্গে জামাল' বা উটের যুদ্ধের পর, হযরত আলী (রা.) বসরাতে *[বর্তমান ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূল এলাকায়]* কিছু সময় কাটান। সেখানে তিনি তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাসকে গভর্নর নিয়োগ করেন। এরপর, জানুয়ারি মাসে তিনি কুফাতে যান। কুফা ছিল ইরাকের তুলনামূলকভাবে একটি নতুন গ্যারিসন শহর/রক্ষীনগরী, যা-কিনা তখন থেকে মাত্র বিশ বছর আগে গড়ে তোলা হয়েছিল। তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র মদীনা থেকে কুফাতে স্থানান্তর করেন। কুফা আধুনিক ইরাকে অবস্থিত। এদিকে, ক্ষমতার আরেকটি কেন্দ্রস্থল দামাস্কাস রয়ে গেল মুয়াবিয়ার নিয়ন্ত্রণে। পরবর্তীকালের জন্য, এই সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এরপরে আর কখনোই মদীনা ইসলামী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় নি।

আলী (রা.) অত্যন্ত ভদ্র ও সরল মানুষ ছিলেন। কিন্তু, তাকে এখন রাজনৈতিক কৌশলের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

হযরত আলীর (রা.) বিভিন্ন অর্জন

ধার্মিকতা, অসাধারণ জ্ঞান ও সাহসিকতার জন্য পরিচিত ছিলেন হযরত আলী (রা.)। মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করতো। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই তিনি কুরআন মুখস্থ করেছিলেন এবং তা মহানবী (সা.)-কে শুনিয়েছিলেন। আর, পরবর্তীকালে তিনি এই ধর্মগ্রন্থের একজন বিশেষজ্ঞ অথরিটিতে পরিণত হন।

আলী (রা.) শুধু হাফেজ-এ-কুরআনই ছিলেন না, কখন কোন আয়াত নাজিল হলো, কোথায় এবং কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হলো, ইত্যাদি, অর্থাৎ, প্রতিটি আয়াতের পটভূমি (শানে নজুল) তিনি জানতেন। প্রায় ত্রিশ বছর মহানবী (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকার ফলে তিনি হাদীস ও সুন্নাহরও অথরিটিতে পরিণত হন। শত শত হাদীস কণ্ঠস্থ করেছেন তিনি। সেসব হাদীস তিনি প্রায়ই বর্ণনা করতেন এবং কুরআন ও হাদীসের বরাত দিয়ে চমৎকার বক্তৃতা করতে পারতেন।

কুরআনের গভীর জ্ঞান থাকার কারণে এটি স্বাভাবিক বিষয় যে, তিনি ইসলামী আইনের অথরিটি হিসেবে বিবেচিত হবেন। আয়েশা (রা.) বলেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে:

> **"তার জন্য, *[আলী]*, যারা সুন্নাহর মধ্যে আছেন তাদের মধ্যে তিনি-ই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন।"**

একইভাবে, আবু হুরায়রাহর এক বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত উমর (রা.) বলেছেন:

> **"বিচারসংক্রান্ত ফয়সালার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে আলী সর্বোত্তম।"**

বাকি খলীফাদের মতো হযরত আলীও (রা.) খুব সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন। মুসলমান হিসেবে তাকে সঙ্কটময় কাল অতিবাহিত করতে হয়েছে। এমনিতেও তিনি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনই বেশি পছন্দ করেছেন। তিনি সাদামাটা পোশাক পরিধান করতেন এবং সাধারণ খাবারই খেতেন। সর্বদাই তিনি অপরের কল্যাণসাধনের প্রতি খেয়াল রাখতেন। প্রায়ই না-খেয়ে থাকতেন। এমনকি খলীফা হওয়ার পরও তিনি সেই আগের মতোই সাদাসিধা জীবনযাপন করেছেন এবং মুসলমানদের জামা'তের খেদমতে সদা-সতর্ক থেকেছেন। কোনো কোনো বিবরণে দেখা যায়, *[এক বেলার]* খাবার হিসেবে তিনি এক পেয়ালা দুধ, এক টুকরো রুটি এবং সামান্য সব্জী খেতেন।

তার চারপাশের অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের মতো কোনো প্রকারের আড়ম্বর ছাড়া সাধারণ ঘরেই বসবাস করতেন তিনি।

একটি ঘটনায় দেখা যায়, একবার তিনি ও তার স্ত্রী ফাতিমা (রা.) শুকনো রুটি খাচ্ছিলেন। তখন এক ফকির তাদের দরোজায় এসে খাবার চায়। তারা সেই সামান্য রুটিটুকু ফকিরকে

দিয়ে দেন এবং দিনের বাকি সময় না-খেয়েই অতিবাহিত করেন। ছেলেদেরকেও তিনি সেই একই শিক্ষা দিয়েছেন। ছেলেদেরকে তিনি বলেছেন:

> **"সৎসঙ্গে বাস করো, অসৎসঙ্গ পরিহার করো। সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার যা তুমি খাও তা হলো হারাম পথে উপার্জিত খাবার। মানুষের প্রতি সদয়চিত্ত হও, এমনকি কেউ যদি তোমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে, তার সঙ্গেও *[সদয়চিত্ত হও]*। কেননা, পরবর্তীতে সেই ব্যক্তিও তোমার প্রতি সদয়চিত্ত হয়ে যাবে।"**

আপাতদৃষ্টিতে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ কেবল ধারাবাহিক সংগ্রাম ও লড়াইয়ের যুগ বলে মনে হতে পারে; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রচেষ্টা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে সুপ্রশিক্ষিত, উদ্যমী ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের এক কেন্দ্রীয় দল তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল না। মূলত, এটা ছিল তাদেরই ধারণকৃত পারস্পরিক ভালবাসা, সহমর্মিতা, ন্যায়-আচরণ ও জ্ঞান-পিপাসার বিভিন্ন মূল্যবোধ, যার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় স্পেনের আন্দালুস ও বাগদাদের বাইতুল হিকমার মতো ইসলামের পরবর্তী স্বর্ণযুগগুলোতে।

হযরত আলীর (রা.) মৃত্যু

মুসলমানদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরও ক্রমবর্ধমান বিভেদ অবশ্যম্ভাবী শঙ্কায় পরিণত হচ্ছিল। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে কুফা নগরীতে হযরত আলী (রা.) নিহত হন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। রমযান মাসে তিনি যখন ফজর নামাজ পড়াচ্ছিলেন, তখন আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম নামক এক খারেজি গুপ্তঘাতক তাকে আক্রমণ করে। দু'দিন শয্যাশায়ী থাকার পর তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে তার ছেলে হাসানের কাছে তিনি নিম্নোক্ত ইচ্ছা ব্যক্ত করেন:

> **"আল্লাহ্‌কে ভালবাসো ও তার আনুগত্য করো। আল্লাহ্‌র পথে মানুষের খেদমতের জন্য বাঁচো। আর, আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের জন্য তোমার উৎকৃষ্ট সময়টি আলাদা করে নিতে ভুলে যেও না; যদিও, তোমার প্রতিটি মুহূর্তই তাঁর জন্য হবে, যদি তুমি আন্তরিকভাবে তোমার লোকদের সেবায় তা কাজে লাগাও।"**

আশ্চর্যজনকভাবে, তিনি তার ছেলেদেরকে নির্দেশ দিলেন, তার হত্যাকারীকে যেন নিগৃহীত করা না হয়। তিনি তার ছেলেদেরকে এই হুকুমও দিলেন, হত্যাকারীকে যেন খাবার প্রদান করা হয় এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করা হয়। স্বীয় হত্যাকারীর প্রতি এই ধরনের দয়ার্দ্র ব্যবহার থেকে তার চরিত্রের অনুপম চিত্র প্রকাশিত হয়। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন:

> **"লোকটির সঙ্গে দয়ার্দ্র ব্যবহার করো এবং তাকে খাবার ও পানি দাও। আমি যদি মারা যাই, তবে তার সঙ্গে ন্যায়বিচার করো। আর, যে-কাজ সে করেছে, তার জন্য তাকে কতল করা হবে। কিন্তু, তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও নিগ্রহমূলক আচরণ করো না। কেননা, মহানবী (সা.) এরকমটি করতে নিষেধ করেছেন।"**

বলা হয়ে থাকে যে, আলীর (রা.) মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ গোপনে দাফন করা হয়েছে। কারণ, আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, তার শত্রুরা হয়তো তার কবরের অসম্মান করবে। খলীফা হারুন আল-রশীদের (শাসনকাল: ৭৮৬ - ৮০৯ খ্রিস্টাব্দ) শাসনামলের আগ পর্যন্ত তার কবরের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে সংশয় ছিল। খলীফা হারুন আল-রশীদকে কোনো ব্যক্তি বলেন যে, হযরত আলীর (রা.) কবর রয়েছে নাজাফের একটি উঁচু স্থানে। *[নাজাফ ইরাকের একটি শহর। এটি বাগদাদের দক্ষিণ দিকে প্রায় ১৬০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। - অনুবাদক]* খলীফা হারুন আল-রশীদের হুকুমে সেখানে একটি বড় মসজিদ এবং মাজার নির্মাণ করা হয়। কথা হলো, তিনি কীভাবে জানলেন যে, সেখানেই হযরত আলীর কবর রয়েছে? এই সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনায় দেখা যায়, ষষ্ঠ শিয়া ইমাম জাফর আল-সাদিক তাকে একথা জানিয়েছেন। আর, জাফর আল-সাদিক এই তথ্য পেয়েছেন তার পূর্ববর্তী শিয়া নেতাদের কাছ থেকে। তবে, শিয়াদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ এখনো বিশ্বাস করে যে, হযরত আলীর (রা.) আসল কবর রয়েছে আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফের রওজা-ই-শরীফে। এটি নীল মসজিদ নামেও পরিচিত।

হযরত আলীর (রা.) উত্তরাধিকার

ইসলামের একজন অথরিটি হিসেবে হযরত আলীকে (রা.) বিবেচনা করা হতো। তার বক্তৃতাসমূহ এবং বিভিন্ন চিঠিপত্র 'নাহ্জ আল-বালাঘা' (বাগ্মীতার পথ) শিরোনামে সংরক্ষিত আছে।

তার ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে তার পরিবারও মানুষের সেবা করে গেছেন। তার ছেলেরা, হাসান এবং হোসেইন, দু'জনেই এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এটা মনে করা হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে আরো মতবিভেদ এড়ানোর জন্য হাসান খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ফলে মুয়াবিয়াহ খলীফা হতে সমর্থ হন। মুয়াবিয়াহর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ পরবর্তীকালে আরবের উমাইয়া রাজবংশ নামে পরিচিতি লাভ করে। তার ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে খোলাফায়ে-রাশেদীনের (সঠিক পথপ্রাপ্ত খেলাফতের) সমাপ্তি ঘটে। মুসলিম সাম্রাজ্যের পরবর্তী শাসকেরা বিভিন্ন রাজবংশের নামে দীর্ঘকাল শাসন করেছে। অবশেষে, ওসমানিয়া (Ottoman) সাম্রাজ্যের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই খেলাফত বিলুপ্ত হয়।

যাহোক, শিয়াদের চোখে হযরত আলী (রা.) হচ্ছেন প্রথম ইমাম। অতঃপর, তার ছেলেরা এই আলখাল্লার অধিকারী। দ্বিতীয় ইমাম হলেন হাসান এবং তৃতীয় ইমাম হলেন হোসেইন। হাসান এবং হোসেইনের রক্তের ধারায় হযরত আলীর (রা.) পরবর্তী বংশধরেরাই হচ্ছে ফাতেমার ধারায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৈহিক বংশধর। আজো তারা **'সৈয়্যদ'** উপাধি নিয়ে অশেষ সম্মানের অধিকারী।

এই বংশধারার উদাহরণ হিসেবে মরক্কোর শরীফগণ এবং ইদ্রিসীয়গণ, ঘানার বনু সালেহগণ হাস্‌সানের পৌত্রদের বংশধর। আর ইয়েমেনের সুলেমানীয়রা হাসানের একজন ছেলের বংশধর।

মুসলমানদের একতার বিষয়টিই হযরত আলীকে (রা.) সবচেয়ে বেশি বিচলিত করেছিল। চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চতুর্দিক থেকে আবেদন আসা সত্ত্বেও, সবগুলো দলকে একত্রিত করার জন্য ক্রমাগতভাবে সংগ্রাম করে গেছেন তিনি। তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা এবং ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই, অধিকতর নরমপন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। এমনকি অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতেও, যখন কিনা মুসলমান সৈন্যদের মুখোমুখি হতে বাধ্য করা হয়েছিল তাকে, তখনো তার অভিপ্রায় ছিল মধ্যস্থতা ও আলোচনা-সংলাপের প্রতি। যাহোক, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের অভিপ্রায়ের সঙ্গে ঈমানের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ফলে হযরত আলীর (রা.) সদিচ্ছা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

হযরত আলীর (রা.) অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকার হচ্ছে তার দ্বারা বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ-নিঃসৃত বাণী (হাদীস) এবং কর্মের (সুন্নাহ) বিবরণসমূহ। তিনি ৫৮৬টি হাদীস বর্ণনা

করেছেন। এই হাদীসগুলো তার কাছ থেকে অন্যান্য বহু লোক শুনেছেন এবং বর্ণনার ধারাবাহিক শৃঙ্খলের অংশে পরিণত হয়েছেন। যেমন, তার ছেলে হাসান ও হোসেইন এবং তারপর আবু মুসা, আবু ইমামাহ এবং আবু হুরায়রাহ।

শিয়াদের মধ্যে বিভক্তি

অচিরেই ইসলামে বহু ফির্কা (উপদল) তৈরি হলো। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হলো সুন্নী এবং শিয়া। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত আলীর (রা.) কিংবা হযরত আয়েশার (রা.) কি এ রকম অভিপ্রায় ছিল? এটি সুনিশ্চিত যে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ, যারা মক্কাবাসীদের হাতে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েছিলেন, তারা অবশ্যই বিভক্তি এবং অন্তর্বিরোধের বিপরীতে একতা এবং ভালবাসা চাইবেন।

তাহলে, এই বিভক্তির পেছনে কোন কোন ঘটনা ও কারণ রয়েছে?

ভিতরে ভিতরে আরবে ইসলামের রাজনীতিকরণের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তুষ্টির চাপা-স্রোত ছিল। সেখানে নিকটবর্তী ইরানের নতুন অনুগামীদেরকে বলা হয়েছে যে, মুসলমান হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য তাদের দরকার একজন আরব পৃষ্ঠপোষক। রাজনৈতিক এবং আর্থিক ক্ষমতা লাভের উপায় হিসেবে, মহানবী (সা.)-এর জাতির অংশীদার হওয়ার বিষয়টিকে কিছু আরব ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল।

ইরানীরা চেয়েছিল ইসলাম ধর্মের উৎসমূলে প্রত্যাবর্তন করতে। কারণ, তারা অনুভব করেছিল মহানবী (সা.)-এর সরাসরি পরিবারের মধ্য দিয়েই এটি একমাত্র সম্ভবপর। আর, হযরত আলীর ছেলেদের পরিবারবর্গই এই প্রতিনিধিত্ব করে। তাই, হযরত আলীর (রা.) শাহাদাত এবং একজন রাজনীতিক আরবের *[মুয়াবিয়াহ]* হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার ঘটনাটিকে তারা বিপর্যয় হিসেবে দেখেছে। আর যখন, হোসেইন ও তার অনুগামীরা কয়েক বছর পর, ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে শহীদ হন, তখন এই ঘটনাও শিয়াদের মর্মজ্বালা ও দুঃখবোধকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এ সমস্ত ঘটনার কথা স্মরণ করে শিয়ারা আজো শোক প্রকাশ করে থাকে। প্রতিবছর ১০ মুহাররাম তারা নিজেদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে ইমাম হোসেইনের শাহাদাতের কথা স্মরণ করে। শিয়াদের মধ্যে কেউ কেউ জায়নামাজে কারবালার মাটি রেখে সেজদা করে থাকে।

এটি বড় আকর্ষণীয় বিষয় যে, আল-সাইয়ুতি বলেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন:

> **"রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ্ তাঁকে ও তাঁর পরিবারের প্রতি রহম করুন এবং শান্তি বর্ষণ করুন, আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, 'আলী, তোমার সঙ্গে ঈসার (আ.) সাদৃশ্য রয়েছে; ইহুদীরা তাকে এতোটাই ঘৃণা করেছে যে, তারা তার মায়ের নামে অপবাদ দিয়েছে। আর খ্রিস্টানরা তাকে এতো ভালবেসেছে যে, তাকে এমন স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে যা তার প্রাপ্য নয়।'"**

মহানবী (সা.) হয়তো জানতেন যে, আলীর (রা.) খেলাফত কালে সে চক্রান্তকারীদের হাতে নিগৃহীত হবে। কিন্তু, পরবর্তী প্রজন্মগুলো তাকে খ্রিস্টানদের মতোই অতিরিক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে *[পূজা করবে]*। যেমন, আলীর (রা.) নামে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়ে থাকে (ইয়া আলী মদদ)।

উপসংহার

পূর্ববর্তী খলীফাদের মতো হযরত আলীরও (রা.) সরাসরি সম্পর্ক ছিল মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রেও তিনি একেবারে প্রথম দিকের ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আরবের বাইরের দুনিয়ায় ইসলাম বিস্তৃত হচ্ছিল বিধায় ন্যায়বিচারের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন। কুরআন সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। অল্প বয়সেই হাফেজ-এ-কুরআন হয়েছিলেন এবং মহানবী (সা.)-কে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন তিনি। আর, মহানবী (সা.)-এর কাছে তিনি কুরআনের মর্মার্থও শিখে নিয়েছেন।

আলী (রা.) যদিও সংশয়াতীতভাবে অত্যন্ত সাহসী ছিলেন; তথাপি, তাকে ঘিরে আবর্তিত হওয়া রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রসমূহ নিয়ন্ত্রণে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। ফলে, অবশেষে তার পতন ঘটে এবং এভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনেরও (সঠিক পথ-প্রাপ্ত খেলাফতের) সমাপ্তি ঘটে। তার বিশেষ মর্যাদার বিষয়ে বহু কিছুই করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে, বহু সংখ্যক মুসলমান (শিয়া) আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, মহানবী (সা.)-এর পর খলীফা হওয়ার ন্যায্য অধিকার একমাত্র হযরত আলীরই (রা.) ছিল।

আজকাল তার নামে যে-সব দাবী উত্থাপন করা হয় এবং তার সঙ্গে অন্য খলীফাদের যে পার্থক্য টানা হয়, সে-সব বিষয়ে হযরত আলী (রা.) কিছুই জানতেন না। বরং, এর বিপরীতে,

পূর্ববর্তী খলীফাদের প্রতি তার পরিপূর্ণ আনুগত্য দেখা যায়। আর, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রেও তার অনিচ্ছুক মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু, যখন তিনি খলীফা হয়ে গেলেন, তখন মুসলিম উম্মতের একতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন।

আঠারো শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এডোয়ার্ড গিবনের মন্তব্য তুলে ধরে এই লেখা শেষ করা যায়। গিবন বলেন:

> **"প্রথম সারির সত্যিকারের মুমেনগণ হয়তো কামনা করবেন ইহকালে এবং পরকালে সামনে চলতে; এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি বেশি সিরিয়াস এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তারপরও কোনো নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তির পক্ষে আলীর উদ্দীপনা ও গুণাবলীকে কখনোই পিছনে ফেলা সম্ভব হবে না। *[কারণ,]* তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সৈনিক এবং দরবেশ। তার প্রজ্ঞার ছোঁয়া এখনও পাওয়া যায় নৈতিক এবং ধর্মীয় বাণীর সংকলনগুলোর মাঝে। আর, মৌখিক বিতর্ক কিংবা তলোয়ারের লড়াই-ই হোক, সমস্ত বিরুদ্ধবাদী নতি শিকারে বাধ্য হয় তার বাগ্মীতা ও পরাক্রমের কাছে।"**

(শেষ)

[The Review of Religions, December 2007 অবলম্বনে]

References

1. *The Concise Encyclopaedia of Islam,* Cyril Glasse, Harper San Francisco, 1999.
2. *Life of Muhammad,* Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Islam International Publications Ltd, Tilford, UK, 1990.
3. *Islam - a short history,* Karen Armstrong, Phoenix Press, London 2001.
4. *The Preaching of Islam,* T. W. Arnold, Aryan Books International, New Delhi, 1998.
5. *Al-Quds,* Mohammad Abdul Hameed Al-Khateeb, Ta-Ha Publishers, London 1998.
6. *Intrigues against Khilafat-i-Rashida and their Impact,* Maulana Sheikh Mubarak Ahmad, Ascot Press, London.
7. *Khulafa-e-Rashideen,* Majeed A Mian, *Review of Religions,* Vol.92, No.3, March 1997.
8. *The Book of Character - writings on character and virtue from Islamic and other sources,* Camille Helminski, The Book Foundation, Bristol 2004.
9. *The History of the Khalifas who took the right way,* Jalaladdin as-Suyuti, Ta-Ha Publishers, London 2006.
10. *Nubuwwat & Khilafat - Prophethood and its successorship,* Islam International Publications Ltd, Tilford, UK, 2006.
11. *The Excellent Exemplar: Muhammad the Messenger of Allah,* Muhammad Zafrulla Khan, The Chaucer Press, UK, 1962.
12. *'Ali Bin Abi Talib - the fourth Caliph of Islam,* Abdul Basit Ahmad, Darussalam Publishers, London, UK, 2001.
13. *The Muqaddimah - an introduction to History,* Ibn Khaldun, Princeton University Press, New Jersey, USA, 2005.
14. *The Decline and Fall of the Roman Empire,* Edward Gibbon, Volume 5, p.381, London, 1858.